ISSN 2227-1635
**বাঙলা সাহিত্যিকী** ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ ১৪২৬

# ফোকলোরচর্চায় ড. মযহারুল ইসলামের মৌলিক ও আধুনিক দৃষ্টিচেতনা

*ড. মুহম্মদ হায়দার

**সার-সংক্ষেপ:** বাংলাদেশে আধুনিক ফোকলোরচর্চার অন্যতম পুরোধা-ব্যক্তিত্ব ড. মযহারুল ইসলাম। পাশ্চাত্য রীতি-পদ্ধতি অনুসরণে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণমুখী ফোকলোরচর্চার ধারাটি প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান তুলনারহিত। ফোকলোরের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি তিনি ফোকলোরচর্চার জন্য সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও ছিলেন উদ্যমী। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফোকলোরের নবপঠন-পাঠন রীতি প্রবর্তনেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বাংলাদেশে শিক্ষায়তনিক ফোকলোরচর্চার সূত্রপাতও তাঁর প্রচেষ্টাতেই। ফোকলোরের উপকরণ সংগ্রহ ও বিবরণমূলক আলোচনার স্থলে তিনি ফোকলোরচর্চার পাশ্চাত্য রীতি-পদ্ধতির প্রয়োগে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা ও গবেষণার পথনির্মাণে যথার্থ ফোকলোরিস্ট বা লোকতত্ত্ববিদের অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। একজন ফোকলোরিস্ট হিসেবে তাঁর মৌলিক কর্ম-তৎপরতা, আধুনিক মননদৃষ্টি এবং শিকড়-অভিমুখী মানবিক চেতনার পরিচয়জ্ঞাপক আলোচনা স্থান পেয়েছে এই নিবন্ধে।

উনিশ শতকে ভারতীয় উপমহাদেশে ফোকলোর অনুসন্ধান, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রকাশের কাজ শুরু হয়। বাংলাভাষী অঞ্চলে বাঙালি লালবিহারী দে (১৮২৪-১৮৯৪) প্রথম বাংলা লোকগল্প সংগ্রহের কাজে ব্রতী হন। বিশ শতকের শুরুতে দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার (১৯৭৭-১৯৬৭) লোককথা সংগ্রহ ও সংকলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এরপর রবীন্দ্রনাথের প্রয়াসে বাংলা ফোকলোরচর্চার বিস্তৃতি ঘটে। দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯)-এর উদ্যোগে বাংলা লোকসাহিত্যের বিশাল রত্নভাণ্ডার সংগৃহীত হয়ে সংকলিত হয়। তাঁর প্রণোদনায় চন্দ্রকুমার দে (১৮৮১-১৯৪৬), আশুতোষ চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪৪), জসীম উদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬) প্রমুখ লোকসাহিত্য সংগ্রহে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। এ-ধারাকে উল্লেখযোগ্যভাবে সমৃদ্ধ করেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩), মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন (১৯০৪-১৯৮৭), ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯), ড. মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০৬-১৯৮২) প্রমুখ মনীষী।

ফোকলোরের (প্রধানত লোকসাহিত্যের) উপকরণ সংগ্রহ, সংকলন ও অল্পবিস্তর তথ্য-বিশ্লেষণের এই ধারাটিকে ফোকলোরচর্চার পটভূমি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বাংলাদেশে আধুনিক ফোকলোরচর্চার পুরোধা হলেন ড. মযহারুল ইসলাম (১৯২৮-২০০৩) ও ড. আশরাফ সিদ্দিকী (জন্ম. ১৯২৭)। পাশ্চাত্য রীতি-পদ্ধতি অনুসরণে শিক্ষায়তনিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণমুখী ফোকলোরচর্চার ধারাটি প্রতিষ্ঠা পায় তাঁদের প্রচেষ্টাতেই। দু'জনেই আমেরিকার ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফোকলোর বিষয়ে গবেষণা করে ঋদ্ধ হন এবং পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন। আশরাফ সিদ্দিকী বিদেশে ফোকলোর পঠন-পাঠনের গতি-প্রকৃতির তথ্য, শ্রেণিকরণের ভিত্তি, টাইপ ও মোটিফ সম্পর্কিত পাশ্চাত্য ধারণাসমূহের বিবরণ তুলে ধরেন তাঁর 'লোকসাহিত্য'[১] গ্রন্থে। তবে তিনি ফোকলোরচর্চার তাত্ত্বিক বা প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে আলোকপাত করেননি। কিন্তু মযহারুল ইসলাম ফোকলোরের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে যেমন তৎপর ছিলেন, তেমনি ফোকলোচর্চার জন্য সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও ছিলেন

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া

অধিকতর উদ্যমী। পাশাপাশি তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফোকলোরের নবপঠন-পাঠন রীতি প্রবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বলা যায়, ফোকলোরের উপকরণ সংগ্রহ ও বিবরণমূলক আলোচনার স্থলে তিনি একক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে শিক্ষায়তনিক ফোকলোরচর্চার সূত্রপাত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এবং উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্রে ফোকলোরচর্চার পাশ্চাত্য রীতি-পদ্ধতির প্রয়োগে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা ও গবেষণার পথনির্মাণে তিনি যথার্থ ফোকলোরিস্ট বা লোকতত্ত্ববিদের ভূমিকা পালন করেন।

সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিক্ষা এবং গবেষণায় আজীবন নিয়োজিত মযহারুল ইসলাম উদার মানবতাবাদী চেতনা এবং অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধে আস্থাবান এক কর্মযোগী মানুষ। বাঙালি জাতির মিশ্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বর্ণাভায় আলোকিত মানসচেতনা নিয়ে তিনি কবিতাচর্চা শুরু করেছিলেন। এই চেতনাই তাঁকে ফোকলোরচর্চার দিকে প্রধাবিত করেছে। ফোকলোরের প্রশস্ত অঙ্গনের বিবিধ ঐতিহ্যিক বৈভবে তিনি অনুভব করেছিলেন গণ-মানুষের নাড়ির স্পন্দন। গণ-মানুষের মুক্তিকামী একজন কবি মযহারুল ইসলাম এই অনুভবে জারিত জীবনবোধ ও শিল্পবোধ নিয়ে বাংলাদেশে ফোকলোরচর্চায় ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করে এ-বিষয়ে নিজেই একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন।

ড. মযহারুল ইসলাম ১৯৬৩ সালে ফোকলোর বিষয়ে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি অর্জনের পাশাপাশি আধুনিক ফোকলোরের পঠন-পাঠনে বিশেষ দৃষ্টিপাত করেন। ১৯৬৪ সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই বিদ্যায়তনিক ফোকলোরচর্চার সূত্রপাত করেন। স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলা একাডেমির প্রথম মহাপরিচালক নিযুক্ত[২] হয়ে তিনি নতুন এই প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তোলার সমান্তরালে ফোকলোরচর্চায় বিশেষ মনোযোগ দেন। বাংলা একাডেমিতে প্রতিষ্ঠা করেন ফোকলোর বিভাগ। আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজন; ইউনেস্কো, ফোর্ড ফাউন্ডেশন, নোরাড প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থার সহায়তায় একাধিক কর্মশালা ও মাঠ-প্রশিক্ষণের আয়োজন করে তিনি বাংলা একাডেমিকে ফোকলোরচর্চার কেন্দ্রে পরিণত করেন। একাডেমিতে ফোকলোরের জেলাভিত্তিক নথি সংরক্ষণ, জার্নাল ও সংগৃহীত উপাদানের সংকলন প্রকাশ প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে ফোকলোরচর্চায় গতির সঞ্চার হয়। ক্রমে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের পাঠ্যসূচিতে ফোকলোরকে গুরুত্ব সহকারে স্থান দেওয়া হয়।

দেশি-বিদেশি ফোকলোরিস্ট ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের কাজটিও ড. মযহারুল ইসলাম করেছেন যথাযথভাবে। ফোকলোর-সংশ্লিষ্ট বৃত্তি, চাকরি, বিদেশ ভ্রমণ, আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগদান ইত্যাকার বহির্দেশীয় সংযোগ-সুবিধা সৃষ্টিতে ড. ইসলাম ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক উভয়বিধ উদ্যোগ গ্রহণে ছিলেন অগ্রণী। আর বহির্বিশ্বের সাথে সংযোগের সুবিধা সৃষ্টির ফলে ফোকলোরচর্চা ক্রমে স্বতন্ত্র ডিসিপ্লিন-এর মর্যাদা লাভ করে। ১৯৯৮ সালে ড. মযহারুল ইসলাম ও তাঁর অনুজ ড. আবদুল খালেক (তৎকালীন উপাচার্য)-এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা পায় 'ফোকলোর বিভাগ'। সময়ের যৌক্তিক দাবি নিয়ে ফোকলোর এখন আধুনিক

বিষয়সমূহের অন্যতম। স্বদেশপ্রীতি, আত্মপরিচয় অনুসন্ধান এবং সৃষ্টিশীল সত্তার বিকাশে ঐতিহ্যমুখী চেতনা এবং কর্মশীলতার বাস্তবায়নে ফোকলোর বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে পরিগণিত। জাতিসত্তার মৌল উপাদানের আধার আপন ঐতিহ্যের স্নিগ্ধতায় অবগাহনে স্নাত ড. ইসলামের অনুভব-চৈতন্যে ফোকলোরচর্চা তাই সমধিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়েছিল।

বাংলাদেশে ফোকলোরচর্চায় ড. মযহারুল ইসলাম কর্মোদ্যোগে যেমন অগ্রণী, গবেষণার ক্ষেত্রেও তেমনি মৌলিকতায় সমুজ্জ্বল। ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত তাঁর 'ফোকলোর: পরিচিতি ও পঠন-পাঠন' গ্রন্থে সর্বপ্রথম আধুনিক ফোকলোরচর্চার একটি রূপরেখা তুলে ধরা হয়। এ-সম্পর্কে ড. ইসলাম গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছেন:

> লোকলোর (Folklore) ও লোকসাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্পর্কে আমার বক্তব্য বর্তমান গ্রন্থে বিধৃত। বিগত কয়েক বছরে দেশে ও বিদেশে আমি এই বিষয়সমূহ নিয়ে যে সমস্ত তথ্য ও সত্য সন্ধান করে ফিরেছি, বর্তমান গ্রন্থে তার পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। ...আমি বর্তমান গ্রন্থে লোকসাহিত্যের কতকগুলো নতুন দিগন্ত উন্মোচনের চেষ্টা করেছি। এ-জাতীয় আলোচনা বাংলা ভাষায় বর্তমান গ্রন্থের পূর্বে কেউ কোথাও করেছেন বলে আমার জানা নেই।[৩]

গ্রন্থটির শুরুতেই তিনি ইংরেজি 'ফোকলোর' (Folklore) শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ নিয়ে বিশদ এবং যৌক্তিক আলোচনা করেছেন। লোকসাহিত্য, লোককৃতি, লোকসংস্কৃতি ইত্যাকার বহুবিধ শব্দ ফোকলোরের প্রতিশব্দরূপে ইতঃপূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে। ড. ইসলাম যৌক্তিক ব্যাখ্যায় বুঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে, ব্যবহৃত শব্দগুলোর কোনোটিই ফোকলোরের প্রতিশব্দ হিসেবে যথার্থ নয়। তিনি নিজে 'লোকলোর' শব্দবন্ধটি তৈরি করে ফোকলোরের বাংলা পরিভাষা হিসেবে ব্যবহারে প্রয়াসী হন। এ-ক্ষেত্রে তাঁর যৌক্তিক বক্তব্য: Folk শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ 'লোক' সম্বন্ধে কোনো মতভিন্নতা নেই। কিন্তু Lore-এর প্রতিশব্দ মেলানো সম্ভব হচ্ছিলো না। তাই Folk-এর প্রতিশব্দ 'লোক'-এর সঙ্গে 'Lore' বাংলায় গ্রহণ করে 'লোকলোর' ব্যবহার করা নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত। তবে ভাষার ব্যবহারিক দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাভাষী জনতা Folklore-কে বাংলায় 'ফোকলোর' বলতেই অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। ড. ইসলাম উদার ও বাস্তববোধসম্পন্ন মানুষ। পাণ্ডিত্যের অহংকারে তিনি কখনও রক্ষণশীল হয়ে পড়েননি। তাই দেখা যায়, যৌক্তিক মত প্রকাশ করার পরেও কেবল ভাষার ব্যবহারিক গুরুত্ব বিবেচনা করে তিনি নিজের অভিমতের পরিবর্তে গণমতকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন এবং পরবর্তী সময়ে 'ফোকলোর' শব্দটি বাংলা ভাষায় গ্রহণের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। এ-সম্পর্কে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন:

> ফোকলোর শব্দটিকে আমি বাংলায় লোকলোর হিসেবে ব্যবহার করবার প্রয়াস পেলেও ইংরেজী ফোকলোর শব্দটিকে অবিকৃত অবস্থায় বাংলায় গ্রহণ করতে কোনো সংকোচ থাকা উচিত নয় বলে বর্তমান সংস্করণে মন্তব্য করেছি। এই প্রসঙ্গে একটি নতুন প্রবন্ধ 'কেন ফোকলোর' (পৃঃ ৫৪) লিখিত হয়েছে এবং আমার প্রাসঙ্গিক বক্তব্যকে এই প্রবন্ধে আমি যথাসাধ্য সুস্পষ্ট করবার চেষ্টা করেছি।[৪]

এ-গ্রন্থে তিনি 'আমাদের লোকসাহিত্যের পঠন-পাঠনে এমন কতগুলো তথ্য, পদ্ধতি, রীতি ও বৈজ্ঞানিক চেতনা পরিবেশন' করবার চেষ্টা করেছেন 'যা কিনা এদেশে প্রায় সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত'[৫]। দ্বিতীয় (১৯৭৪) ও তৃতীয় (১৯৯৩) সংস্করণে গ্রন্থটিতে বেশ কয়েকটি নতুন প্রবন্ধ সংযোজিত হয়, যা ফোকলোর বিষয়ে ড. ইসলামের সক্রিয়তার স্মারক। ক্রমাগত পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে গ্রন্থটি ফোকলোরের অধ্যয়ন ও গবেষণার ক্ষেত্রে আধুনিক রীতি-পদ্ধতি সম্পর্কিত আকর গ্রন্থের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে। আলোচনার পদ্ধতি সম্পর্কিত ড. ইসলামের মন্তব্য থেকে ফোকলোরচর্চার আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও রীতি বিষয়ে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়:

> আমি বিবরণধর্মী ফোকলোরের পথ পরিত্যাগ করেছি, কেননা সেই পথ মূলত সংগ্রাহকের পথ। সংগ্রহের মূল্যকে আমি অস্বীকার করি নে। কিন্তু সংগ্রহকেও পদ্ধতিমাফিক হতে হবে। সংগৃহীত প্রত্যেকটি উপাদানকে সংগ্রহের সময় Contexual, Functional, Metafolkloric, Oral Literary Criticism ইত্যাদির আলোকে যাচাই করে সংগ্রহ কর্মটি সম্পাদন করতে হবে। অন্যথা সংগৃহীত উপাদান বিজ্ঞানমনস্ক ফোকলোরবিশারদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।[৬]

উল্লিখিত গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের আগে প্রায় এক দশকব্যাপী ড. মযহারুল ইসলাম ফোকলোরচর্চায় নানা নিরীক্ষা ও গবেষণাকর্ম সম্পাদন করে বাংলাদেশ এবং ভারতে সে চর্চার ধারাকে ঋদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত করবার ক্ষেত্রে অন্যতম পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। এই কালপর্বে ফোকলোর-সংশ্লিষ্ট তাঁর গ্রন্থগুলোর নাম উল্লেখ করা যায়। ১৯৮২ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'ফোকলোর চর্চায় রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি', ১৯৮৫ সালে দিল্লি থেকে প্রকাশিত 'Folklore: The Pulse Of The People', এবং কলকাতার রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি প্রকাশিত 'Social Change And Folklore' গ্রন্থ তিনটিতে ফোকলোর সম্পর্কে তাঁর সাধনার বিস্তরণকে অনুভব করা যায়। এ-ছাড়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত তাঁর পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ 'A History Of Folktale Collections In Bangladesh, India And Pakistan'-এর দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণে (প্রথম প্রকাশ ১৯৭০, বাংলা একাডেমি, ঢাকা) ফোকলোর বিষয়ে তাঁর সাধনার পরিচয় বিধৃত।

১৯৭৫-এর রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পর প্রলোভন সত্ত্বেও সামরিক শাসকের সহযোগী হিসেবে কাজ করতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে ড. মযহারুল ইসলাম ৩২ মাস বিনা বিচারে কারাভোগ করেন। মুক্ত হয়ে শাসকচক্রের কূটচালে তিনি কর্মহীন হয়ে পড়েন। এ-সময় প্রিয় অনুজ ড. আবদুল খালেক (সাবেক উপাচার্য, রাবি)-এর কাছে লেখা চিঠিপত্রে[৭] আর্থিক দুর্দশা ও অনিশ্চিত জীবন সম্পর্কে তাঁর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কথা জানা যায়। কলকাতায় অতিথি অধ্যাপকের কর্ম জুটলে তিনি কিছুটা উদ্বেগমুক্ত হন। শত উৎকণ্ঠার মধ্যেও ফোকলোরচর্চায় তাঁর ছেদ পড়েনি। এরপর বেশ কয়েক বছর তিনি ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে ফোকলোর, নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণায় নিয়োজিত থাকেন। বিশ্বভারতীতে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথের ডায়েরি পাঠ এবং কবির কর্মোদ্যোগ সম্পর্কে নানা তথ্য অবগত হয়ে তিনি ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত হন। দেশে ফেরার পর থেকে আমৃত্যু ফোকলোর এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাধনার কেন্দ্রে অবস্থান

করেছে। তিনি রচনা করেছেন 'রবীন্দ্রনাথ: কবি সাহিত্যশিল্পী এবং কর্মযোগী' (১৯৯৬), 'The Theoretical Study Of Folklore' (১৯৯৮), 'আঙ্গিকতার আলোকে ফোকলোর' (১৯৯৯) এবং সম্পাদনা করেছেন 'বিচিত্র দৃষ্টিতে ফোকলোর' (১৯৯৭) গ্রন্থ।

ফোকলোর বিষয়ে ড. মযহারুল ইসলামের অভিনিবেশ এবং একাগ্রতার স্বাক্ষর উল্লিখিত গ্রন্থসমূহে ছবির মতো স্পষ্ট। প্রতিটি গ্রন্থে ফোকলোর সম্পর্কে ড. ইসলামের চিন্তার মৌলিকতা আমাদেরকে বিস্মিত করে। এ-ছাড়া জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সেমিনারে পঠিত বহু প্রবন্ধে[৮] তিনি ফোকলোর সম্পর্কে প্রাতিস্বিক ভাবনা ও বিশ্লেষণ তুলে ধরে ফোকলোরচর্চার ধারাকে গতি দান করেছেন।

ফোকলোরচর্চায় গবেষণার পাশাপাশি বিবিধ কর্মোদ্যোগেও ড. মযহারুল ইসলাম ছিলেন অগ্রণী ব্যক্তিত্ব। ১৯৯০ সালে তাঁর উদ্যোগে গঠিত হয় 'বাংলাদেশ ফোকলোর সোসাইটি'। এর প্রাণপুরুষ তিনি। তাঁর পৌরহিত্যে এই সোসাইটি সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন, পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থ প্রকাশ ইত্যাদি কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে বাংলাদেশে ফোকলোরচর্চার গতি-প্রকৃতিতে যোগ করে নবতর মাত্রা। রাজশাহী ও ঢাকায় 'আন্তর্জাতিক ফোকলোর কনফারেন্স' আয়োজন এবং 'ফোকলোর' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ সোসাইটির প্রশংসনীয় ও উল্লেখযোগ্য কর্মোদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত। ড. ইসলামের উদ্যোগে সাড়া দিয়ে দেশি-বিদেশি বহু পণ্ডিত 'আন্তর্জাতিক ফোকলোর কনফারেন্স'-এ যোগদান করেন। কনফারেন্সগুলোর বিভিন্ন পর্যায়ে পঠিত বহু প্রবন্ধ সুধীমহলের প্রশংসা অর্জন করে। সোসাইটির মুখপত্র 'ফোকলোর' সম্পাদনাও ড. ইসলামের বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে পরিগণিত। ড. ইসলামের জীবদ্দশায় 'ফোকলোর' পত্রিকার ৬টি সমৃদ্ধ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রতিটি সংখ্যা দেশি-বিদেশি বিদগ্ধ পণ্ডিত ও ফোকলোরবিদের বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধে সমৃদ্ধ। উল্লেখ করা প্রয়োজন, 'ফোকলোর' পত্রিকার যাবতীয় ব্যয় ড. ইসলাম ব্যক্তিগতভাবে বহন করতেন। এমনকি একাধিক 'আন্তর্জাতিক ফোকলোর সম্মেলন'-এর ব্যয়ভারও তিনি সানন্দে বহন করেছেন। বস্তুত বাংলাদেশে ফোকলোরের বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ ও পঠন-পাঠনের একটি বুনিয়াদ গড়ে তোলার জন্য তিনি সাধ্যমত সব রকম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। জাতীয় পর্যায়ে একটি 'ফোকলোর ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠার জন্যেও তিনি প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

নগরবিকাশের যুগে লেখাপড়া-জানা নাগরিকরা নগরকেন্দ্রিক যে সাহিত্যধারা নির্মাণ করে আভিজাত্যের অহংকারে তৃপ্তির ঢেকুর তোলেন, তারাও জানেন, নগরজীবনের মতো তাদের সৃজিত-পঠিত সাহিত্যও অনিকেত এবং শিকড়চ্যুতির শুষ্কতায় প্রায়শ হাঁসফাঁস করে। তাই এদের একটা শ্রেণি ফোকলোরের প্রতি উন্নাসিক মনোভাব পোষণ করলেও সৃজনশীল মানুষেরা যুগে যুগে বৃহত্তর জনজীবনের সংস্কৃতিধারায় অবগাহন করেই তাঁদের সৃষ্টিসম্ভারকে ঋদ্ধ ও শিকড়মুখী করেছেন। ফোকলোরের প্রতি শিক্ষিতজনের উন্নাসিকতার আরও একটা কারণ তৈরি হয়েছে বাংলাদেশে ফোকলোরের শিক্ষায়তনিক পঠন-পাঠন শুরু হওয়ার পরে। ড. মযহারুল ইসলাম, ড. আবদুল খালেক কিংবা শামসুজ্জামান খানের মতো ফোকলোরচর্চায় নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তির সংখ্যা এখনও অঙ্গুলিমেয়। কিন্তু ফোকলোরকেন্দ্রিক

ডিগ্রি-শিকারির সংখ্যা অল্প নয়। কোনো কোনো ডিগ্রিপ্রাপ্ত ব্যক্তি অভিসন্দর্ভ রচনার পরে একটিও প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেননি। কেউ কেউ কয়েকটি সঠিক বাক্য লিখতেও হিমশিম খান। আবার চাকরিতে উন্নতির জন্যে কারও কারও দুয়েকটি রচনা স্বকথিত গবেষণা পত্রিকায় ছাপা হয়। এ-ধরনের ব্যক্তিরা যখন কেবল ডিগ্রির জোরে নিজেদের ফোকলোরিস্ট বলে দাবি করেন, তখন উন্নাসিকতার একটা বড় কারণ মুখ ব্যাদান করে সকলের সামনে দাঁড়ায়। তবে এ-ক্ষেত্রে  একটা সাধারণ ভুল প্রায়ই হয়ে থাকে। ঐসব ব্যক্তির পরিবর্তে উন্নাসিকতার ছায়াটি গিয়ে পড়ে তাদের ব্যবহৃত ফোকলোরের ওপর। অথচ ফোকলোরেই অনুভব করা যায় একটি জাতির নাড়ির স্পন্দন। জাতির নৃতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনধারার নানা বৈভব মুক্তোদানার মতো ছড়িয়ে থাকে ফোকলোরের প্রতিটি উপাদানে। বিষয়টি স্বীয় সৃজনক্ষমতা ও মননশক্তি দিয়ে অনুভব করেছিলেন ড. মযহারুল ইসলাম। ফোকলোরকে জনতার নাড়ির স্পন্দন আখ্যা দিয়ে তিনি অনুভবের আলো ছড়িয়ে রচনা করেন ফোকলোর-সংশ্লিষ্ট গ্রন্থসমূহ। তাঁর শিকড়সন্ধানী দৃষ্টি স্বীয় জাতিসত্তা ও সংস্কৃতির পরিচয়সুত্র খুঁজে পায় ফোকলোরের সমৃদ্ধ জমিনে। এই ফোকলোরই বাঙালি জাতীয়তাবাদের পথে তাঁকে করে তোলে আন্তর্জাতিকতাবাদী। তাঁর মানবতন্ত্রী মননচেতনা অধিকতর ঋদ্ধ হয় ফোকলোরের বহুভঙ্গিম আলোকচ্ছটায়। তাই তিনি বিশ্বাসের ভূমিতে দাঁড়িয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করতে পারেন:

> আমাদের পরিচয়ের শিকড় যদি সন্ধান করতে হয়, তাহলে ফোকলোর জগতে আমাদের প্রবেশ করতেই হবে। কেননা ফোকলোর লোকসংস্কৃতির সবচেয়ে উজ্জ্বল ও শক্তিশালী অঙ্গন হিসেবে সমগ্র পৃথিবীতে আজ স্বীকৃত।[৯]

এই বিশ্বাসই ড. ইসলামকে ফোকলোরচর্চায় আত্মনিবেদিত ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত করেছে। বাংলাদেশে ফোকলোরের চর্চা, অনুশীলন, গবেষণা, পঠন-পাঠন ও বিশ্লেষণমুখী আলোচনায় তাঁর ক্লান্তিহীন সাধনা আমাদের সাহিত্য ও জাতীয় মননচৈতন্যের দিগন্তকে ক্রমাগত সমৃদ্ধ করেছে। ফোকলোরচর্চায় তাঁর ধারাবাহিক কর্মসাধনা তাঁকে একজন পথিকৃৎ পণ্ডিত ও ফোকলোরিস্টের-এর মর্যাদাবান আসনে করেছে সমাসীন। তাঁর সাধনপথ পরবর্তী প্রজন্মের ফোকলোর-অনুরাগীর কাছে অবশ্য অনুসরণীয় বিবেচিত হতে বাধ্য।

তথ্যসূচি:

---

১ আশরাফ সিদ্দিকী: লোকসাহিত্য (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৬৩

২ ড. মযহারুল ইসলাম ২২ মার্চ ১৯৭২ তারিখে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক নিযুক্ত হন। তথ্যসুত্র: আশফাক-উল-আলম ও অন্যান্য সম্পাদিত: লেখক অভিধান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১২২

৩ মযহারুল ইসলাম: প্রথম সংস্করণের ভূমিকা, ফোকলোর: পরিচিতি ও পঠন-পাঠন, তৃ-স, ১৯৯৩ পৃ. এগারো

৪ মযহারুল ইসলাম: দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা, পূর্বোক্ত, পৃ. নয়

৫ মযহারুল ইসলাম: দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা, পূর্বোক্ত, পৃ. নয়

[৬] মযহারুল ইসলাম: প্রথম সংস্করণের ভূমিকা, পূর্বোক্ত, পৃ. বারো

[৭] ড. মযহারুল ইসলামের চিঠি, অমিয় আনন্দ ধ্বনি (প্রফেসর আবদুল খালেক সত্তর বছর পূর্তি সংবর্ধনাগ্রন্থ), অনীক মাহমুদ সম্পাদিত, ধানসিঁড়ি সাহিত্য পরিষদ, রাজশাহী, ২০০৭, পৃ. ৩৪০-৩৪৭

[৮] মুহম্মদ মজিরউদ্দীন মিয়া: মযহারুল ইসলাম জীবন ও সাধনা, ড. মযহারুল ইসলাম সপ্ততিতম জন্মজয়ন্তী সংবর্ধনাগ্রন্থ, ফোকলোর গবেষণা সংসদ, রাজশাহী, ১৯৯৮, পৃ. ২১-২৪

[৯] মযহারুল ইসলাম সম্পাদিত: বিচিত্র দৃষ্টিতে ফোকলোর, বাংলাদেশ ফোকলোর সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৭, ভূমিকা।